## আত্মবিলাপ: মাইকেল মধুসূদন দত্ত

- ১৮২৪ সালের ২৫ জানুয়ারি যশোর জেলার কপোতাক্ষ নদের তীরে সাগরদাঁড়ি গ্রামে, এক জমিদার বংশে তাঁর জন্ম। পিতা রাজনারায়ণ দত্ত ছিলেন কলকাতার একজন প্রতিষ্ঠিত উকিল। মা জাহ্নবী দেবীর তত্ত্বাবধানে মধুসূদনের শিক্ষারম্ভ হয়। প্রথমে তিনি সাগরদাঁড়ির পাঠশালায় পড়াশোনা করেন। পরে সাত বছর বয়সে তিনি কলকাতা যান এবং খিদিরপুর স্কুলে দু'বছর পড়বার পর ১৮৩৩ সালে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। সেখানে তিনি বাংলা, সংস্কৃত ও ফারসি ভাষা শেখেন। হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালেই মধুসূদনের প্রতিভার বিকাশ ঘটে। ১৮৩৪ সালে তিনি কলেজের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ইংরেজি 'নাট্য-বিষয়ক প্রস্তাব' আবৃত্তি করে উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।
- হিন্দু কলেজে মধুসূদনের সহপাঠী ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, গৌরদাস বসাক প্রমুখ, যাঁরা পরবর্তী জীবনে স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সহপাঠীদের মধ্যে মধুসূদন উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কলেজের পরীক্ষায় তিনি বরাবর বৃত্তি পেতেন। এ সময় নারীশিক্ষা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করে তিনি স্বর্ণপদক লাভ করেন।
- হিন্দু কলেজে অধ্যয়নের সময়েই মধুসূদন কাব্যচর্চা শুরু করেন। তখন তাঁর কবিতা *জ্ঞানান্বেষণ, Bengal Spectator, Literary Gleamer, Calcutta Library Gazette, Literary Blossom, Comet* প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হতো। এ সময় থেকেই তিনি স্বপ্ন দেখতেন বিলেত যাওয়ার। তাঁর ধারণা ছিল বিলেতে যেতে পারলেই বড় কবি হওয়া যাবে।
- তাঁর পিতা বিবাহ ঠিক করলে মধুসূদন ১৮৪৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং তখন থেকে তাঁর নামের পূর্বে 'মাইকেল' শব্দটি যুক্ত হয়। কিন্তু হিন্দু কলেজে খ্রিস্টানদের অধ্যয়ন নিষিদ্ধ থাকায় মধুসূদনকে কলেজ ত্যাগ করতে হয়।
- ১৮৪৪ সালে মধুসূদন বিশপস্ কলেজে ভর্তি হন এবং ১৮৪৭ পর্যন্ত এখানে অধ্যয়ন করেন। এখানে তিনি ইংরেজি ছাড়াও গ্রিক, ল্যাটিন ও সংস্কৃত ভাষা শেখার সুযোগ পান। এ সময় ধর্মান্তরের কারণে মধুসূদন তাঁর আত্মীয়স্বজনদের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তাঁর পিতাও এক সময় তাঁকে অর্থ পাঠানো বন্ধ করে দেন। অগত্যা মধুসূদন ভাগ্যান্বেষণে ১৮৪৮ সালে মাদ্রাজ গমন করেন। সেখানে তিনি দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেন। প্রথমে *মাদ্রাজ মেইল অরফ্যান অ্যাসাইলাম স্কুলে* (১৮৪৮ – ১৮৫২) এবং পরে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হাইস্কুলে শিক্ষকতা (১৮৫২ – ১৮৫৬) করেন।
- মাদ্রাজের সঙ্গে মধুসূদনের জীবনের অনেক ঘটনা জড়িত। এখানেই তিনি সাংবাদিক ও কবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি *Eurasion* (পরে *Eastern Guardian*), *Madras Circulator and General Chronicle* ও *Hindu Chronicle* পত্রিকা সম্পাদনা করেন এবং *Madras Spectator*-এর সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন (১৮৪৮ – ১৮৫৬)।
- মাদ্রাজে অবস্থানকালেই Timothy Penpoem ছদ্মনামে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *The Captive Ladie* (১৮৪৯) এবং দ্বিতীয় গ্রন্থ *Visions of the Past* (১৮৪৯) প্রকাশিত হয়।
- রেবেকা ও হেনরিয়েটার সঙ্গে মধুসূদনের প্রথম ও দ্বিতীয় বিবাহ মাদ্রাজেই সংঘটিত হয়। মাদ্রাজে বসেই তিনি হিব্রু, ফরাসি, জার্মান, ইটালিয়ান, তামিল ও তেলেগু ভাষা শিক্ষা করেন।
- এর মধ্যে মধুসূদনের পিতামাতা উভয়ের মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তিনি দ্বিতীয় স্ত্রী হেনরিয়েটাকে নিয়ে ১৮৫৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতা আসেন। সেখানে তিনি প্রথমে পুলিশ কোর্টের কেরানি এবং পরে দোভাষীর কাজ করেন। এ সময় বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেও তিনি প্রচুর অর্থোপার্জন করেন।
- এসময়ই তাঁর বন্ধুবান্ধবরা তাঁকে বাংলায় সাহিত্যচর্চা করতে অনুরোধ জানান এবং তিনি নিজেও ভেতর থেকে এরকম একটি তাগিদ অনুভব করেন। রামনারায়ণ তর্করত্নের *রত্নাবলী* (১৮৫৮) নাটক ইংরেজিতে অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি বাংলা নাট্যসাহিত্যে উপযুক্ত নাটকের অভাব অনুভব করেন এবং তাঁর মধ্যে তখন বাংলায় নাটক রচনার সংকল্প তৈরি হয়। এই সূত্রে তিনি কলকাতার পাইকপাড়ার রাজাদের বেলগাছিয়া থিয়েটারের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন। এমন একটি পরিস্থিতিতে নাট্যকার হিসেবেই মধুসূদনের বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে পদার্পণ ঘটে।

- কলকাতায় থাকার এই সময়কালটিকেই বলা চলতে পারে মধুসূদনের বাংলা সাহিত্যসাধনার প্রথম পর্যায় (১৮৫৯ - ১৮৬২)। দুটি প্রহসন, দুটি নাটক, তিনটি কাব্য এসময় তিনি রচনা করেন।
- ১৮৬৩ সালে তিনি প্যারিস হয়ে ভার্সাই নগরীতে যান এবং সেখানে প্রায় দুবছর অবস্থান করেন। ভার্সাইতে অবস্থানকালে তাঁর জীবনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। এখানে বসেই তিনি ইতালীয় কবি পেত্রার্কের অনুকরণে বাংলায় সনেট লিখতে শুরু করেন। বাংলা ভাষায় এটিও এক বিস্ময়কর নতুন সৃষ্টি। এর আগে বাংলা ভাষায় সনেটের প্রচলন ছিল না। এই সনেটগুলি ১৮৬৬ সালে *চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী* নামে প্রকাশিত হয়।
- ভার্সাই নগরীতে দুবছর থাকার পর মধুসূদন ১৮৬৫ সালে পুনরায় ইংল্যান্ড যান এবং ১৮৬৬ সালে গ্রেজ-ইন থেকে ব্যারিস্টারি পাস করেন।
- ১৮৬৭ সালের ৫ জানুয়ারি দেশে ফিরে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় যোগ দেন। কিন্তু ওকালতিতে সুবিধে করতে না পেরে ১৮৭০ সালের জুন মাসে মাসিক এক হাজার টাকা বেতনে হাইকোর্টের অনুবাদ বিভাগে যোগদান করেন। দুবছর পর এ চাকরি ছেড়ে তিনি পুনরায় আইন ব্যবসা শুরু করেন। এবারে তিনি সফল হন, কিন্তু অমিতব্যয়িতার কারণে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। অমিতব্যয়িতার ব্যাপারটি ছিল তাঁর স্বভাবগত। একই কারণে তিনি বিদেশে অবস্থানকালেও একবার বিপদগ্রস্ত হয়েছিলেন এবং বিদ্যাসাগরের আনুকূল্যে সে বার উদ্ধার পান।
- ১৮৭২ সালে মধুসূদন কিছুদিন পঞ্চকোটের রাজা নীলমণি সিংহ দেও-এর ম্যানেজার ছিলেন। জীবনের শেষ পর্বে তিনি একটি অসম্পূর্ণ নাটক ও অসম্পূর্ণ গদ্যরচনা করেছিলেন।
- মধুসূদনের শেষজীবন অত্যন্ত দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছে। ঋণের দায়, অর্থাভাব, অসুস্থতা, চিকিৎসাহীনতা ইত্যাদি কারণে তাঁর জীবন হয়ে উঠেছিল দুর্বিষহ। শেষজীবনে তিনি উত্তরপাড়ার জমিদারদের লাইব্রেরি ঘরে বসবাস করতেন। স্ত্রী হেনরিয়েটার মৃত্যুর তিনদিন পরে ১৮৭৩ সালের ২৯ জুন বাংলার মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত কপর্দকহীন অবস্থায় জেনারেল হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

[মধুসূদনের জীবনীটি banglapaedia.org থেকে অল্পবিস্তর সংস্কার সহযোগে গৃহীত হয়েছে।]

- **মধুসূদনের জীবন সম্পর্কে মোহিতলাল মজুমদার:**

১. "মধূসূদন বাল্যে গ্রাম্য পাঠশালায় পড়াশুনা করিয়াছিলেন। অতি অল্প বয়সেই তাঁহার মেধা ও স্মৃতিশক্তির স্ফূরণ হইয়াছিল, এইজন্য সেই কালেই বাংলা ভাষা ও বাঙালী জীবনের কতকগুলি মূল সংস্কার তাঁহার অন্তরে গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল। ইহার পরে আর কখনও মাতৃভাষা বা স্বজাতীয় সমাজের সহিত এমন ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ তাঁহার ঘটে নাই। কলিকাতায় ছাত্রজীবনে বারো হইতে আঠারো বৎসর বয়স পর্যন্ত, তিনি যে সমাজে বাস করিয়াছিলেন, তাহা প্রাচীন ও নব্য আদর্শের একটা অস্বাভাবিক মিশ্রণে প্রায় বীভৎস হইয়া উঠিতেছিল।— 'ইয়ং বেঙ্গলে'র স্বেচ্ছাচার এবং তৎপ্রতি প্রবীণগণের কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় মনোভাব, এমন কি তাহাকে প্রশ্রয়দান— মধুসূদনের মত যুবকের পক্ষে স্বাস্থ্যকর হয় নাই। গ্রামে বাসকালে বাঙালী জীবনের যে সারল্য ও বাংলার জলমাটির যে স্নিগ্ধ মাধুরী তাঁহার বালক-হৃদয় পুষ্ট করিয়াছিল তাহাও ক্রমশঃ যেন মুছিয়া গেল। তারপর হিন্দুকলেজের সেই ভাবপ্রবণ, আত্মাভিমানী দুরাকাঙ্ক্ষ বালক-ছাত্র বিদেশী সাহিত্যের মধ্য দিয়া বিদেশী ভাবজীবনকে আত্মসাৎ করিয়াছিল; বাংলাভাষা ও বাঙালী জীবনকে জীর্ণ মলিন বস্ত্রখণ্ডের মতো পরিত্যাগ করিয়াছিল, এবং পরিশেষে খ্রিস্টান ধর্ম ও ইংরেজ মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়া সে গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনে আপনাকে স্বজাতি সমাজ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিযুক্ত করিয়াছিল। তারও পরে, বহুকাল বিদেশে বাস করায় মাতৃভাষার অভ্যাসও আর ছিল না।" (*কবি শ্রীমধুসূদন*, করুণা প্রকাশনী)

২. "মধুসূদনের জীবনে যে দ্বন্দ্ব, ও সেই দ্বন্দ্বের ফলে যে শোচনীয় পরিণাম ঘটিয়াছিল, কাব্যে তিনি সেই দ্বন্দ্বকে উত্তীর্ণ হইতে চাহিয়াছিলেন— কাব্য রসাবেশের অচেতন উল্লাসে।" (*কবি শ্রীমধুসূদন*, করুণা প্রকাশনী)

৩. "মধুসূদনের চরিত্রে যে আত্মপ্রত্যয় ও অসমসাহসিকতা ছিল, তাহারই বলে তিনি বাংলা কাব্যের অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন; তাঁহার কাব্যের রাবণ যেমন সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, জীবনে তিনিও তেমনই সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন;..." (*কবি শ্রীমধুসূদন*, করুণা প্রকাশনী)

৪. "তাঁহার প্রতিভার প্রকাশ যেমন আকস্মিক, তেমনই অসম্পূর্ণ ও ক্ষণস্থায়ী। তাঁহার লক্ষ্য স্থিরবদ্ধ ছিল না, দুঃসাহসের উত্তেজনায় তাঁহার প্রতিভার ক্ষণিক বিস্ফূরণমাত্র হইয়াছিল। সেই আতসবাজীর অধীর অগ্ন্যুৎসবে কয়েকটি রঙিন আলোকচ্ছটা

আভাসমাত্রেই মিলাইয়াছে; কেবল যে দুই একটি স্ফুলিঙ্গ অতি উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে যেটি বৃহত্তম, সেইটিই অনির্ব্বাণ হইয়া কাব্যের নক্ষত্রলোকে স্থান পাইয়াছে।" (*কবি শ্রীমধুসূদন*, করুণা প্রকাশনী)

❖ **আত্মবিলাপ কবিতার রচনাকাল ও প্রথম প্রকাশ:**

*আত্মবিলাপ* কবিতাটি *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-র ১৭৮৩ শকাব্দের (১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ) আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিকে একটি ব্রাহ্মসংগীত লিখে দিতে অনুরোধ করলে, ব্রাহ্মসংগীতের পরিবর্তে কবি এই কবিতাটি লিখে তিনি সত্যেন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দেন। ১৮৬১ সালে রচিত এই কবিতাটিকে আধুনিক রীতিতে রচিত প্রথম বাংলা গীতিকবিতা বলে অনেকে মনে করেন। (দ্র. ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত *মধুসূদন রচনাবলী*)

**আত্মবিলাপ**

**১**

আশার ছলনে ভুলি কী ফল লভিনু,হায়,
তাই ভাবি মনে?
জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে ধায়,
ফিরাব কেমনে?
দিন দিন আয়ুহীন হীনবল দিন দিন ,—
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না? এ কি দায়!

**২**

রে প্রমত্ত মন মম! কবে পোহাইবে রাতি?
জাগিবি রে কবে?
জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন-কুসুম-ভাতি
কত দিন রবে?
নীর বিন্ধু, দূর্বাদলে, নিত্য কিরে ঝলঝলে?
কে না জানে অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতি?

**৩**

নিশার স্বপন-সুখে সুখী যে কী সুখ তার?
জাগে সে কাঁদিতে!
ক্ষণপ্রভা প্রভা -দানে বাড়ায় মাত্ত আঁধার
পথিকে ধাঁধিতে!
মরীচিকা মরুদেশে,নাশে প্রাণ তৃষাক্লেশে; —
এ তিনের ছল সম ছল রে এ কু-আশার।

**৪**

প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে সাদে
কী ফল লভিলি?
জ্বলন্ত-পাবক-শিখা-লোভে তুই কাল ফাঁদে
উড়িয়া পড়িলি
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ, হায়
না দেখলি না শুনিলি, এবে রে পরাণ কাঁদে

**৫**

বাকি কি রাখিলি তুই বৃথা অর্থ-অন্বেষণে,
সে সাধ সাধিতে?
ক্ষত মাত্ত হাত তোর মৃণাল-কণ্টকগণে
কমল তুলিতে
নারিলি হরিতে মণি, দঃশিল কেবল ফণী
এ বিষম বিষজ্বালা ভুলিবি, মন, কেমনে!

**৬**

যশোলাভ লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি হায়,
কব তা কাহারে?
সুগন্ধ কুসুম-গন্ধে অন্ধ কীট যথা ধায়,
কাটিতে তাহারে?
মাৎসর্য-বিষদশন, কামড়ে রে অনুক্ষণ!
এই কি লভিলি লাভ,অনাহারে,অনিদ্রায়?

**৭**

মুকুতা-ফলের লোভে, ডুবে রে অতল জলে
যতনে ধীবর,
শতমুক্তাধিক আয়ু কালসিন্ধু জলতলে
ফেলিস, পামর!
ফিরি দিবে হারাধন, কে তোরে, অবোধ মন,
হায় রে, ভুলিবি কত আশার কুহক-ছলে!

❖ **জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে যায়...:** পরম্পরিত রূপক। জীবন রূপ প্রবাহ (নদী) = জীবনপ্রবাহ। কাল রূপ সিন্ধু (সমুদ্র) = কালসিন্ধু।

❖ **রে প্রমত্ত মন মম...:** প্রমত্ত = অতিশয় মত্ত, অত্যাসক্ত (বিষয়ভোগে—), অনবহিত, ভ্রান্ত

❖ **জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন-কুসুম-ভাতি/কতদিন রবে:** পরম্পরিত রূপক। জীবন রূপ উদ্যান = জীবন উদ্যান। ভাতি = শোভা, দীপ্তি। যৌবন-কুসুম-ভাতি = যৌবন-রূপ-কুসুমের দীপ্তি।

- **নীরবিন্দু দূর্বাদলে নিত্য কি রে ঝলঝলে?:** কাকুবক্রোক্তি। দুর্বাদলের (দূর্বাঘাসের দল; দল = পত্র) উপর জলবিন্দু কি প্রতিনিয়ত ঝলঝল করে?
- **কে না জানে অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতি:** অম্বু = জল। অম্বুদ = অম্বু দান করে যে; মেঘ। অম্বুমুখে = মেঘের মুখে। অম্বুদমুখে > অম্বুমুখে (আর্ষপ্রয়োগ)। মেঘ এখানে সমাসোক্তি অলঙ্কারে ভূষিত। সদ্যঃপাতী = ক্ষীণজীবী। অর্থাৎ, কে না জানে যে জলবিম্ব মেঘমুখে ক্ষীণজীবি। (সদ্যঃ = তৎক্ষণাৎ, এখনই।)
- **ক্ষণপ্রভা প্রভা দানে:** ক্ষণপ্রভা = বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ তার ক্ষণকালীন প্রভা পথিককে ধন্দে ফেলবার জন্যই দান করে।
- **এ তিনের ছল সম ছল রে এ কু-আশার:** নিশার স্বপ্ন, বিদ্যুতের ক্ষণকালীন আলো, মরীচিকা —এই তিন। এটি মালোপমা। উপমেয় এক, উপমান বহু (এখানে তিনটি)। কু-আশা উপমেয়। নিশার স্বপ্ন, বিদ্যুতের ক্ষণকালীন আলো, মরীচিকা উপমান। সাদৃশ্যবাচক শব্দ 'সম'। সাধারণ ধর্ম ছলনা।
- **প্রেমের নিগড় গড়ি...:** নিগড় = শৃঙ্খল, পায়ের বেড়ি।
- **জ্বলন্ত পাবক শিখা:** জ্বলন্ত অগ্নিশিখা।
- **পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায় ধাইলি অবোধ হায়:** প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষা।
- **মাৎসর্য-বিষদশন:** মাৎসর্য = ঈর্ষা। বিষদশন = বিষদাঁত।

### *চম্পা* : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারি, নিমতা গ্রামে মাতুলালয়ে। মাতামহ রামদাস মিত্র, মাতামহী বিমল দেবী। পিতামহ উনিশ শতকের বাঙালি নবজাগরণের পুরোধা-পুরুষ অক্ষয়কুমার দত্ত। আনুমানিক ২১ বৎসর বয়সে কনকলতা দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়। পিতামহের বিজ্ঞানুরাগ ও সাহিত্যপ্রীতি বংশপরম্পরায় লাভ করেছিলেন তিনি। তাঁর কবিতা মূলত ছাপা হতো প্রবাসী ও ভারতী পত্রিকায়। এছাড়াও বিচিত্রা, বঙ্গলক্ষী, সাহিত্য প্রভৃতি পত্রিকাতেও তাঁর লেখা প্রকাশিত হতো। প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ সালে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকায়। প্রথম কাব্যগ্রন্থ সবিতা প্রকাশিত হয় ১৯০০ সালে, উকিল-বন্ধু শ্রী সৌরেন্দ্রনাথ মিত্রের ব্যয়ে। এটি ছিল মোট ২৬ পাতার একটি কবিতা-পুস্তক। ১৯০২-০৩ সালে কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। ১৯১০-১৫ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় তাঁর। ১৯১৫ সালে রবীন্দ্রনাথ, তাঁর পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী প্রভৃতির সঙ্গে কাশ্মীর ভ্রমণ করেন। ১৯০৬ সালে প্রকাশিত তাঁর বেণু ও বীণা কাব্যগ্রন্থটি তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ সখাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন— সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, যতীন্দ্রনাথ বাগচী, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী, সতীশচন্দ্র রায়, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সৌরিন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, অতুলপ্রসাদ সেন। নবকুমার কবিরত্ন ছদ্মনামে লিখতেন সাহিত্যচিন্তামূলক গদ্য। কাব্যসঞ্চয়ন এই নামকরণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

| **জীবৎকালে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ** | | **মৃত্যুর পর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ** | |
|---|---|---|---|
| **কাব্যগ্রন্থ** | **প্রকাশকাল** | **কাব্যগ্রন্থ** | **প্রকাশকাল** |
| সবিতা | ১৯০০ | বেলা শেষের গান | ১৯২৩ |
| সন্ধিক্ষণ | ১৯০৫ | বিদায় আরতি | ১৯২৪ |
| বেণু ও বীণা | ১৯০৬ | **কাব্যসংগ্রহ** | **প্রকাশকাল** |
| হোমশিখা | ১৯০৭ | কাব্যসঞ্চয়ন | ১৯৩০ |
| তীর্থসলিল | ১৯০৮ | সত্যেন্দ্রনাথের শিশুকবিতা | ১৯৪৫ |
| তীর্থরেণু | ১৯১০ | **অন্যান্য রচনা** | |
| ফুলের ফসল | ১৯১১ | **অসমাপ্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস** | **প্রকাশকাল** |
| কুহু ও কেকা | ১৯১২ | ডঙ্কানিশান | প্রবাসী, ১৩৩০, আষাঢ়-কার্তিক; ১৯২৩ |
| তুলির লিখন | ১৯১৪ | **নাটিকা** | **প্রকাশকাল** |
| মণিমঞ্জুষা | ১৯১৫ | ধুপের ধোঁয়ায় | গ্রন্থাকারে: ১৯২২ |
| অভ্রআবীর | ১৯১৬ | **প্রবন্ধ** | **প্রকাশকাল** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| হসন্তিকা | ১৯১৭ | অতি পান্ডিত্যের উপদ্রব | ভারতী, ১৩২৩; ১৯১৬ |
| | | ছন্দসরস্বতী | |

- ইংরেজি সাহিত্যে রোমান্টিক যুগের প্রথম কাব্যান্দোলনের কালপর্বটি মোটামুটিভাবে ১৭৯৩ থেকে ১৮৩০ এই সময়পর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত বলে ধরা হয়। পূর্ববর্তী নব্যধ্রুপদী যুগের কাব্যদর্শ থেকে মৌলিকভাবে স্বতন্ত্র এই কাব্যান্দোলনের প্রথম পদধ্বনি শুনতে পাওয়া গিয়েছিল উইলিয়াম ব্লেকের কবিতায়। তারপর ওয়ার্ডসওয়ার্থ আর কোলরীজের Lyrical Ballads-এর কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে এই কাব্যাদর্শ প্রতিষ্ঠালাভ করে। তীব্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বোধ-ই এই কাব্যদর্শের মৌল ভিত্তি। যে ধর্ম-জাতি-শ্রেণি নিরপেক্ষ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ রেঁনেসা-পরবর্তী সময় থেকেই ধীরে ধীরে রূপায়িত হয়ে উঠছিল। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের তির্যক প্রকাশ দেখা গিয়েছিল রেস্টোরেশন যুগের মহাকবি মিলটনের Paradise Lost-এ। তবে রোমান্টিক কাব্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবোধের প্রকাশ তির্যক নয়, সরাসরি। ফলে ব্যক্তিচেতনা, ব্যক্তিক অনুভূতি-র প্রকাশের উপর উপর জোর পড়ল। ওয়ার্ডওয়ার্থ তাঁর কবিতাকে চিহ্নিত করেছিলেন 'powerful overflow of spontaneous feeling' বলে। বস্তুত 'অনুভূতি' যা 'ব্যক্তিগত' ও 'একান্ত' তাই হয়ে উঠল রোমান্টিক কবিতার বৈশিষ্ট্য।
- বাংলা গীতিকবিতা বলতে রোমান্টিক কবিতা বোঝাটা সমীচিন নয়। যে কাব্যে সুরসংযোজিত হয় সেই গীতিকবিতা। কিন্তু পারিভাষিক ভাবে গীতিকবিতা বলতে রোমান্টিক কবিতাই বোঝায়। বাংলা রোমান্টিক কাব্যকে আমরা বলবো আধুনিক বাংলা গীতিকবিতা।
- বাংলা আধুনিক গীতিকবিতার গর্ভসময় উনিশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধের সূচনাকাল। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় মনে করেছেন বাংলা গীতিকবিতার আবির্ভাব বিলম্বিত—

  "...১৮৭০ সাল হইতে গীতিকবিতা ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে বাংলা কাব্যজগতে এক বিরাট পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে: ক্লাসিক কাব্যধারা বজায় থাকিবে, না, রোমান্টিক কাব্যধারার জয় হইবে? শেষ পর্যন্ত রোমান্টিক গীতিকবিতার জয় হইয়াছে এবং বিহারীলালের ব্যতিক্রমই সর্ব্বসম্মত-নিয়মে পরিণত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই গীতিকাব্যধারার জয় ঘোষিত হইয়াছে। মধুসূদনের মহাকাব্যের বিপুল ধারা দুর্বল অক্ষম অনুকারকদের হাতে পড়িয়া ব্যর্থতার মরুবালুতে শুষ্ক হইয়াছে; বিহারীলালের সংকীর্ণ রোমান্টিক ধারা রবীন্দ্রগীতি সমুদ্রে পতিত হইয়া সার্থকতা লাভ করিয়াছে। বাংলা কাব্য মহাকাব্যের পথ পরিত্যাগ করিয়া গীতিকবিতার ধারাকেই নিজস্ব পথ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে।" (*ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকবিতা*)
- বিহারীলাল-রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িক উনিশ শতকের বাংলা গীতিকবিদের যে তালিকা অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় দিয়েছেন তাতে ৭৮ জন কবির নাম আছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: অক্ষয় চৌধুরী (১৮৫০ - ১৮৯৮), অক্ষয় বড়াল (১৮৬৫ - ১৯১৮), কামিনী রায় (১৮৬৪ - ১৯৩৩), গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৫ - ১৯১৮), নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭ - ১৯০৯), দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৮ - ১৯২০), মানকুমারী বসু (১৮৬৩ - ১৯৪৩) প্রমুখ।
- অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় উনিশ শতকের বাংলা গীতিকবিতাকে বিষয়ানুক্রমিকভাবে ৬টি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করেছেন। যথা: (১) প্রেমকবিতা (২) দেশপ্রেমের কবিতা (৩) গার্হস্থ্য জীবনের কবিতা (৪) প্রকৃতি-কবিতা (৫) বিষাদ-কবিতা (৬) তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতা
- ১৮৭০ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে যেসব কবি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কাব্যভাষা ও ভঙ্গির দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁদের অনেকের মধ্যে সর্বাধিক। এই কবিদের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: চিত্তরঞ্জন দাস (১৮৭০ - ১৯২৫), বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০ - ১৮৯৯), দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী (১৮৭৩ - ১৯২৭), করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭ - ), যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮ - ১৯৪৮), কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮২ - ), কিরণধন চট্টোপাধ্যায় (১৮৮৭ - ১৯৩১), কালিদাস রায় (১৮৮৯ - ), সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৭০ - ১৯২২) প্রমুখ।
- কিন্তু তথাকথিত রোমান্টিক স্বতঃস্ফূর্ততা নয়, রূপের দিক থেকে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা ধ্রুপদী রীতির কাব্যদর্শকেই বহন করছে। অবশ্য বিষয়ের দিক থেকে সে রোমান্টিকই। হরপ্রসাদ মিত্র লিখেছেন:

"সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় তাঁর ব্যক্তিস্বভাবের বৈদগ্ধ, নানা কলারুচি এবং পারিপাট্যস্পৃহা— তিনটি গুণই প্রতিফলিত হয়েছে। সাহিত্যে রূপগত পারিপাট্যের দিকে বেশি ঝোঁক দেওয়া ক্লাসিক কাব্যরীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'সবিতা' থেকে শুরু করে তাঁর মুদ্রিত কাব্যগ্রন্থের শেষ রচনাটি অবধি এই ক্লাসিক সংযম-সংহতির দিকেই সত্যেন্দ্রনাথ অপেক্ষাকৃত বেশি অভিনিবিষ্ট ছিলেন।" (সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা ও কাব্যরূপ)

- "বিচিত্র প্রসঙ্গ, বিভিন্ন মনন, অজস্র প্রযুক্তি এবং অকপট পরিশ্রম তাঁর রচনায় অনায়াসদৃশ্য,—কিন্তু সার্থক হৃদয়োত্তাপ কদাচ অভিব্যক্ত।" (হরপ্রসাদ মিত্র, *সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ*)

**চম্পা**

আমারে ফুটিতে হ'লো বসন্তের অন্তিম নিশ্বাসে,
বিষণ্ণ যখন বিশ্ব নির্মম গ্রীষ্মের পদানত;
রুদ্র তপস্যার বনে আধ ত্রাসে আধেক উল্লাসে,
একাকী আসিতে হ'লো সাহসিকা অপ্সরার মতো।
বনানী শোষণ-ক্লিষ্ট মর্মরি' উঠিল এক বার,
বারেক বিমর্ষ কুঞ্জে শোনা গেল ক্লান্ত কুহু স্বর;
জন্ম-যবনিকা-প্রান্তে মেলি' নব নেত্র সুকুমার
দেখিলাম জলস্থল, - শুন্য, শুষ্ক, বিহ্বল, জর্জর।
তবু এনু বাহিরিয়া,- বিশ্বাসের বৃন্তে বেপমান, –
চম্পা আমি, -খর তাপে আমি কভু ঝরিবো না মরি,
উগ্র মদ্য-সম রৌদ্র - যার তেজে বিশ্ব মুহ্যমান, –
বিধাতার আশির্বাদে আমি তা সহজে পান করি।
ধীরে এনু বাহিরিয়া, ঊষার আতপ্ত কর ধরি';
মূর্ছে দেহ, মোহে মন,- মুহুর্মুহু করি অনুভব!
সূর্যের বিভূতি তবু লাবণ্যে দিতেছ তনু ভরি';
দিনদেবে নমস্কার! আমি চম্পা! সূর্যের সৌরভ

- 'চম্পা' *ফুলের ফসল* কাব্যগ্রন্থের কবিতা। এই কাব্যগ্রন্থে মোট ১০৮টি কবিতা আছে।
- "এক দিকে ক্লাসিক কাব্যরীতির সংযম, অন্যদকে রোমান্টিক আগ্রহের কথঞ্চিৎ ব্যাকুলতা— এই দুই কবিধর্মের যৌগপদ্য এবং সেই সঙ্গে চিন্তাবিমুখ বিশুদ্ধ গীতিকবিতার অন্তরাবেগ 'ফুলের ফসলের' প্রায় সব কবিতাতেই অল্পবিস্তর চিহ্ন রেখে গেছে।" (হরপ্রসাদ মিত্র, *সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ*)
- "বহিঃপ্রকৃতির রূপলাবণ্যের সমারোহ থেকে দৃষ্টি প্রসৃত হয়ে মাঝে মাঝে গভীর অন্তর্মুখিতার প্রবণতা জেগেছে,— উদ্ভাসিত হয়েছে তাঁর অন্তরের অখণ্ড ধ্যানলোক।" (পূর্বোক্ত)
- চম্পা কবিতাটি চতুর্মাত্রিক মিশ্রবৃত্ত মহাপয়ার ছন্দে রচিত। মাত্রাবিন্যাস এরকম: ৪ | ৪ || ৪ | ৪ |২
- এ কবিতার বিষয় গ্রীষ্মপ্রকৃতি। গোটা কবিতাটি সমাসোক্তি অলঙ্কারে ভূষিত।

- **উল্লিখন (Allusion) :** কবিতায় কোনো পৌরাণিক প্রসঙ্গের উল্লেখ থাকলে তাকে উল্লিখন অলঙ্কার বলে। এ কবিতায় রুদ্রের তপস্যার প্রসঙ্গটি উল্লিখিত হয়েছে। রুদ্রের তপস্যার প্রসঙ্গটি পাওয়া যায় কালিদাসের *কুমারসম্ভব* কাব্যে। এ কাব্যের পৌরাণিক উৎস: রামায়ণ, মহাভারত, মৎস্যপুরাণ প্রভৃতিতে মিলবে। কালিদাসের কাব্যে শিবনিন্দায় সতীর দেহত্যাগের পর শিবের তপস্যা ও সেই তপস্যাভঙ্গের পর শিব-পার্বতীর বিবাহ ও কার্ত্তিকেয়-র জন্ম পর্যন্ত কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এই কাব্যের তৃতীয় সর্গে দেখি, ইন্দ্রের আদেশে ঋতুরাজ বসন্তকে নিয়ে কামদেব মদন শিবের ধ্যানভঙ্গ করতে গেলেন। পার্বতী শিবের সম্মুখে পূজা দিতে গেলে কাম পুস্পশর নিক্ষেপ করে শিবের হৃদয়ে কামনার সঞ্চার করতে গেলেন। রুষ্ট শিব তৃতীয় নয়নের অগ্নিতে কামদেবকে ভস্ম করলেন। কামদেব ভস্ম হলে মদনপত্নী রতি আত্মবিসর্জন দিতে গেলে দৈববাণী হল যে শিব-পার্বতীর বিবাহ হলে শিবের বরে কামদেব পুনরায় জীবন ফিরে পাবেন। এই পৌরাণিক প্রসঙ্গটিকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর *কল্পনা* কাব্যগ্রন্থের (১৮৯৯) 'মদনভস্মের পূর্বে' ও 'মদনভস্মের পর' কবিতায় গ্রহণ করেছিলেন। 'মদনভস্মের পর' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন:

"পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একি সন্ন্যাসী
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে!
ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে উঠে নিশ্বাসি
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।
ভরিয়া উঠে নিখিল-ভব রতিবিলাপ সংগীতে

সকল দিক কাঁদিয়া উঠে আপনি।
ফাগুন মাসে নিমেষ-মাঝে না জানি কার ইঙ্গিতে
শিহরি উঠি মুরছি পড়ে অবনী।"

❖ শিবের ঐ তপস্যারত মূর্তি ও মদনের পুস্পশরাঘাতে জ্বলে ওঠা তাঁর রুদ্রনয়নের উল্লিখনকে স্বীকরণ করেই রবীন্দ্রনাথ বৈশাখের রুদ্রমূর্তিটিকে গড়ে তোলেন। *কল্পনা* কাব্যগ্রন্থের (১৮৯৯) 'বৈশাখ' কবিতাতেই দেখা মিলবে ঐ রুদ্রমূর্তির। রবীন্দ্রনাথের এই বৈশাখ-কল্পনার উত্তরাধিকার দেবেন্দ্রনাথ সেনের কবিতা বহন করছে, তেমনই সত্যেন্দ্রনাথের কবিতাতেই সেই উত্তরাধিকারের দেখা মিলবে।

**বৈশাখ**

**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**

হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ,
ধুলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল
তপঃক্লিষ্ট তপ্ত তনু, মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল
কারে দাও ডাক-
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ!

ছায়ামূর্তি যত অনুচর
দগ্ধতাম্র দিগন্তের কোন্ ছিদ্র হতে ছুটে আসে!
কী ভীষ্ম অদৃশ্য নৃত্যে মাতি উঠে মধ্যাহ্ন-আকাশে
নিঃশব্দ প্রখর-
ছায়ামূর্তি তব অনুচর!

মত্তশ্রমে শ্বসিছে হুতাশ,
রহি রহি দহি দহি উগ্রবেগে উঠিছে ঘুরিয়া,
আবর্তিয়া তৃণপর্ণ, ঘূর্ণচ্ছন্দে শূন্যে আলোড়িয়া
চূর্ণ রেণুরাশ--
মত্তশ্রমে শ্বসিছে হুতাশ।

দীপ্তচক্ষু হে শীর্ণ সন্ন্যাসী,
পদ্মাসনে ব'স আসি রক্তনেত্র তুলিয়া ললাটে,
শুষ্কজল নদীতীরে শস্যশূন্য তৃষাদীর্ণ মাঠে
উদাসী প্রবাসী--
দীপ্তচক্ষু হে শীর্ণ সন্ন্যাসী!

জ্বলিতেছে সম্মুখে তোমার
লোলুপ চিতাগ্নিশিখা, লেহি লেহি বিরাট অম্বর,
নিখিলের পরিত্যক্ত মৃতস্তূপ বিগত বৎসর
করি ভস্মসার--
চিতা জ্বলে সম্মুখে তোমার।

হে বৈরাগী, করো শান্তিপাঠ।
উদার উদাস কণ্ঠ যাক ছুটে দক্ষিণে ও বামে,
যাক নদী পার হয়ে, যাক চলি গ্রাম হতে গ্রামে,
পূর্ণ করি মাঠ---
হে বৈরাগী, করো শান্তিপাঠ।

সকরুণ তব মন্ত্র-সাথে
মর্মভেদী যত দুঃখ বিস্তারিয়া যাক বিশ্ব-'পরে,
ক্লান্ত কপোতের কণ্ঠে, ক্ষীণ জাহ্নবীর শ্রান্তস্বরে,

অশ্বত্থছায়াতে---
সকরুণ তব মন্ত্র-সাথে।

দুঃখ সুখ আশা ও নৈরাশ
তোমার-ফুৎকার-লুব্ধ ধুলা-সম উড়ুক গগনে,
ভ'রে দিক নিকুঞ্জের স্খলিত ফুলের গন্ধ-সনে
আকুল আকাশ---
দুঃখ সুখ আশা ও নৈরাশ।

তোমার গেরুয়া বস্ত্রাঞ্চল
দাও পাতি নভস্তলে, বিশাল বৈরাগ্যে আবরিয়া
জরা-মৃত্যু ক্ষুধা-তৃষ্ণা লক্ষকোটি নরনারী-হিয়া
চিন্তায় বিকল---
দাও পাতি গেরুয়া অঞ্চল।

ছাড়ো ডাক হে রুদ্র বৈশাখ!
ভাঙিয়া মধ্যাহ্নতন্দ্রা জাগি উঠি বাহিরিব দ্বারে,
চেয়ে রব প্রাণীশূন্য দগ্ধতৃণ দিগন্তের পারে
নিস্তব্ধ নির্বাক্---
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ!

**বৈশাখ**

**দেবেন্দ্রনাথ সেন**

কপালে কঙ্কণ হানি' মুক্ত করি চুল
বাসন্তী যামিনী আহা কাঁদিয়া আকুল!

স্বামী তার চৈত্রমাস অনঙ্গের মত,
দক্ষিণে ঈষৎ হেলি' জানু করি নত
কার তপ ভাঙিবারে করিছে প্রয়াস?
রুদ্রের মূরতি ও যে ! —এ কি সর্বনাশ!
ললাটে অনল হের ধক ধক জ্বলে!
সর্বাঙ্গে বিভূতি ভস্ম মাখি' কুতূহলে
তপে মগ্ন— চিনিলে না বৈশাখ দেবেরে?
হে চৈত্র! এ নিশি-শেষে, নিয়তির ফেরে
হারইলে প্রাণ আহা! নাশিতে জীবন

রোষান্ধ বৈশাখ ওই মেলিল নয়ন!
দিগঙ্গনা হাঁকি ডাকে— "কি কর কি কর!"
নব ঊষা বলে "ক্রোধে সম্বর সম্বর"।
কোকিল ডাকিল মুহু করিয়া মিনতি।
সম্ভ্রমে অশোক পুষ্প করিল প্রণতি!
বৃথা! বৃথা! বৈশাখের দু'চক্ষু হইতে
নিঃসরিল অগ্নিকণা বেগে আচম্বিতে!
ভস্ম হ'ল চৈত্রমাস! হয়ে অনাথিনী
মুছিল সিন্দূরবিন্দু বাসন্তী যামিনী!

## *বাবরের প্রার্থনা* : শঙ্খ ঘোষ

- শঙ্খ ঘোষের জন্ম ১৯৩২ সালে অবিভক্ত বাংলার চাঁদপুরে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *দিনগুলি রাতগুলি* (১৯৫৬)। এছাড়াও লিখেছেন *নিহিত পাতাল ছায়া* (১৯৬৭), *মূর্খ বড়ো সামাজিক নয়* (১৯৭৬), *বাবরের প্রার্থনা* (১৯৭৬), *গন্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ* (১৯৯৪) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ।
- 'বাবরের প্রার্থনা' কবিতাটি *বাবরের প্রার্থনা* কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। ৪৭টি কবিতা সম্বলিত এই গ্রন্থটি ত্রি-পর্যায়ে (মণিকর্ণিকা, খড়, হাতেমতাই) বিন্যস্ত। এটি প্রথম পর্ব মণিকর্ণিকার শেষতম কবিতা। কবিতাটির রচনাকাল: ১৯৭৪-র শেষদিক।
- শঙ্খ ঘোষের কাব্যসাধনা শুরু হয়েছিল পঞ্চাশের দশকে। সুমিতা চক্রবর্তী তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন:
- "পঞ্চাশের দশকে নতুন কবিদের যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত 'শতভিষা' পত্রিকা, ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায়। রাজনৈতিক ঘোষণার প্রত্যক্ষতা অনেকখানি বর্জন করে ব্যক্তিগত বাসনা ও উপলব্ধির যে-তলকে তাঁরা স্পর্শ করতে চাইলেন, সেখানে স্বীকারোক্তি, রোমান্টিকতা, নিসর্গপ্রীতি এবং প্রেম-চেতনার শরীরী অভিব্যক্তি প্রাধান্য পেল। তাঁদের রচনায় সচেতন শিল্পীতা ছিল কিন্তু দুরূহ শব্দাবলী, বৈদগ্ধের ফলে আহৃত জ্ঞানকে তাঁরা কিছুটা প্রচ্ছন্ন রাখতেই চেষ্টা করলেন। কবিতা ফিরে গেল হৃদয়ের আবেগকে কাব্য-ভাষায় রূপ দেবার প্রাথমিক আকাঙ্ক্ষায়। স্বাধীনতা এর একটা কারণ হতে পারে।

  এই কবিদের মধ্যে ছিলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, অলোক সরকার, অরবিন্দ গুহ, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, উৎপলকুমার বসু..." (বিংশ শতাব্দীর কবিতার ধারা ও বিবর্তন)
- "এঁদের পূর্বসূরিদের অনেকেই কবিতা লিখেছিলেন 'এই' অথবা 'ওই' তত্ত্ব নিয়ে। কিন্তু 'কৃত্তিবাস' অথবা 'শতভিষা' কবিপত্রের সঙ্গে জড়িত এই কবিরা শুরু করে দিয়েছিলেন অ-তাত্ত্বিক (non-ideational) কবিতা লিখতে।... এই কবিরাই আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাসে প্রথম "কবিতা বাতলে দেবে না মানে, সে শুধু হয়ে উঠতে থাকবে" (আর্চিবল্ড ম্যাকলিশ)— ধারণার কাছাকাছি থেকে কবিতা রচনা করতে চেয়েছেন। কবির সঙ্গে জায়মান কবিতার বিবর্তনমান সম্পর্কই ছিল সাধ্য শর্ত। এই মহতী অনিশ্চিতির প্রসাদগুণেই আমরা পেয়েছি উৎপলকুমার বসু শঙ্খ ঘোষ ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মতো কয়েকজন কবিকে। এঁদের কারও কবিতায় বিশ্বাসের ঘাটতি নেই, যদি কোনো অভাব থেকে থাকে তা হল গোঁড়া তাত্ত্বিক প্রত্যয়ের। কোনো একটি 'ব্যক্তিত্বে'র ছাঁচে কবিতাকে ঢালাই করেন নি বলেই এঁরা অনেক দিন পর্যন্ত এগিয়েছেন।" (অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, 'আধুনিকতার সংজ্ঞা', অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত *আধুনিক কবিতার ইতিহাস*)
- ষাটের দশকের শেষ দিক থেকে সারা দেশ জুড়ে সৃষ্টি হচ্ছিল ভূমিহীন কৃষকদের আন্দোলন। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৭ সালে নকশালবাড়ির আন্দোলনের ঘটনায় সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে শুরু হয়ে যায় বিক্ষিপ্ত কৃষক আন্দোলন। প্রশাসনের পাল্টা দমননীতির সূত্রপাত ঘটে ও তার অভিঘাত ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। সারা দেশের ছাত্র ও যুবসমাজের একাংশ এই আন্দোলনের শরিক হয়। রাষ্ট্র কঠোর দমননীতি গ্রহণ করে। সামাজিক ও রাজনৈতিক এই প্রেক্ষাপটেই সত্তর দশকের যাত্রা শুরু। নকশাল আন্দোলনের অভিঘাত বাংলার সংস্কৃতিতে স্তিমিত হয়ে আসতে না আসতে দেশজুড়ে শুরু হয় জরুরি অবস্থা।

**বাবরের প্রার্থনা**

**শঙ্খ ঘোষ**

এই তো জানু পেতে বসেছি, পশ্চিম
আজ বসন্তের শূণ্য হাত -
ধ্বংস করে দাও আমাকে যদি চাও
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।

কোথায় গেল ওর স্বচ্ছ যৌবন
কোথায় কুরে খায় গোপন ক্ষয়।
চোখের সমুখে এই সমূহ পরাভব
বিষায় ফুসফুস ধমনী শিরা।

জাগাও শহরের প্রান্তে প্রান্তরে
ধূসর শূণ্যের আজান গান;
পাথর করে দাও আমাকে নিশ্চল
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।

না কি এ শরীরের পাপের বীজানুতে
কোনই ত্রাণ নেই ভবিষ্যের?
আমারই বর্বর জয়ের উল্লাসে
মৃত্যু ডেকে আনি নিজের ঘরে?

না কি এ প্রাসাদের আলোর ঝলসানি
পুড়িয়ে দেয় সব হৃদয় হাড়
এবং শরীরের ভিতরে বাসা গড়ে
লক্ষ নির্বোধ পতঙ্গের ?

আমারই হাতে এত দিয়েছ সম্ভার
জীর্ণ করে ওকে কোথায় নেবে?
ধ্বংস করে দাও আমাকে ঈশ্বর
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।

❖ *কবিতার মুহূর্ত* গ্রন্থে 'বাবরের প্রার্থনা' কবিতাটির অনুভাবন মুহূর্ত নির্দেশ করতে গিয়ে শঙ্খ ঘোষ লিখেছেন:

"শেষ হয়ে আসছে ১৯৭৪।

বড়ো মেয়েটি বেশ অসুস্থ তখন, ডাক্তারেরা ভালো ধরতে পারছেন না রোগটা ঠিক কোথায়। শুয়ে আছে অনেকদিন, মুখের লাবণ্য যাচ্ছে মিলিয়ে। অথচ তখন তার ফুটে ওঠবার বয়স। মন্থর হয়ে আছে মনটা।...

ঘুরে বেড়াচ্ছি যাদবপুর ক্যাম্পাসের মধ্যে, দিনের ক্লাস আর সন্ধ্যার ক্লাসের সন্ধিমুখে অনিশ্চিত ফাঁকা বিকেল। বন্ধুরা কেউ সঙ্গে নেই সেদিন। পশ্চিম থেকে পূবে রাস্তার উপর পায়চারি করতে করতে ঘরের ছবির সঙ্গে মনে ভিড় করে আসে ক্যাম্পাসেরও পুরোনো অনেক ছবি। দু-একটি ছেলেমেয়ে কখনো কখনো পাশ দিয়ে চলে যায়, তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয় কদিন আগেও এখানে যত প্রখরতা ঝলসে উঠত নানা সময়ে, তা যেন একটু স্তম্ভিত হয়ে আছে আজ। কেবল যে এখানে তা তো নয়, গোটা দেশ জুড়েই সে কি খুব শান্তির সময় ছিল: একেবারেই নয়। সংঘর্ষ অশান্তিতেই বরং ভরে ছিল দিনগুলি। এই পথ, ওই মাঠ, এর প্রতিটি বিন্দু কোনো-না-কোনো উন্মাদনার চিহ্ন ধরে আছে, ভুলের, লাঞ্ছনার, আত্মক্ষয়ের কিন্তু সঙ্গে কিছু স্বপ্নেরও, কিছু জীবনেরও। আজ প্রশমিত হয়ে আছে সব। কিছু একটা হবার কথা ছিল, অলক্ষ্যে কোনো প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু হলো না ঠিক, হয়ে উঠল না। কিন্তু কেন হলো না? আমরাই কি দায়ী নই? কিছু কি করেছি আমরা, করতে পেরেছি? আমাদের অল্প বয়স থেকে সমস্তটা সময়-স্তূপ হয়ে ঘিরে ধরতে থাকে মাথা। ফিরে আসে মেয়ের মুখ। মনে পড়ে আমার নিষ্ক্রিয়তার কথা।...যেন সমস্ত শরীর ভরে উদগত হয়ে উঠতে চায় অতল থেকে কোনো প্রার্থনা, সকলের জন্য মনে এল নামাজের ছবি।... দিন আর রাত্রির মাঝে অল্প সময়ের জন্য পরিত্যক্ত করিডর, তার শেষ প্রান্তে আচ্ছন্ন একলা ঘর, টেবিলের সামনে এসে বসি।..."

❖ **মিথের ব্যবহার:** আবুল ফজলের বাবরনামা-য় বাবর শেষ জীবন সম্পর্কিত মিথটি এ কবিতার কাঠামোয় প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে গোধরার যুদ্ধে বঙ্গ-বিহারের সম্মিলিত শক্তিকে পরাজিত করে বিজয়োল্লাসে প্রমত্ত বাবর আলোকৎসবে বিহ্বল রাজপ্রাসাদে ফিরে এসে দেখলেন তাঁর একমাত্র পুত্র তরুণ হুমায়ুন এক দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সম্মুখীন। বাবর তাঁর একমাত্র পুত্রের জীবনভিক্ষার জন্য আল্লাহ-র কাছে প্রার্থনা করলেন, নিজের জীবনের বিনিময়ে চাইলেন পুত্রের আরোগ্য। কিংবদন্তী এই যে, হুমায়ুনের আরোগ্যলাভের দুই বা তিনমাসের মধ্যে ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর ক্রমশ স্বাস্থ্যক্ষয় হতে হতে বাবরের মৃত্যু হয়।

## *আন্তিগোনে মঞ্চ: কলকাতা* : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

- ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ৬ অক্টোবর কলকাতায় জন্ম। প্রথম কাব্য *যৌবন বাউল* (১৯৬৬)। এরপর একে একে প্রকাশিত হয়েছে: *নিষিদ্ধ কোজাগরী* (১৯৬৬), *রক্তাক্ত ঝরোখা* (১৯৬৯), *ঈথার দুহিতা* (১৯৭১), *ছৌকাবুকির মুখোশ* (১৯৭৩), *গিলোটিনে আলপনা* (১৯৭৭), *দেবীকে স্নানের ঘরে নগ্ন দেখে* (১৯৮৩), *দুই বন্ধু* (১৯৮৪), *ঝরছে কথা আতস কাঁচে* (১৯৮৫), *অস্তসূর্য এঁকে দিল টেম্পেরা* (১৯৯৮) ইত্যাদি।
- 'আন্তিগোনে মঞ্চ: কলকাতা' কবিতাটি *গিলোটিনে আলপনা* কাব্যগ্রন্থের কবিতা।
- অলোকরঞ্জন শব্দসচেতন কবি। তাঁর কবিতায় মিথের ব্যবহার সহজেই চোখে পড়ে। *গিলোটিনে আলপনা* কাব্যগ্রন্থ থেকেই দেখতে পাই তাঁর কবিতায় নকশাল আন্দোলনের ঘটনা ছাপ ফেলেছে। সমাজসচেতন হয়ে উঠেছেন তিনি।
- "অলোকরঞ্জনের পথ বিরোধাভাসের পথ, যা সরলজটিল, প্রত্যাশিত-অপ্রত্যাশিতের মিশ্রপথ, কখনো নির্বিকার, কখনো বেদনাগ্রাহ্য, মননশীলতায় দীর্ণ। তিনি কত যে শব্দবন্ধ তৈরি করলেন তা ভাবতে অবাক হয়ে যেতে হয়। 'ঘন আশ্লেষে উদ্যত দ্রৌপদী' লিখতে পারলেন তিনি। লিখতে পারলেন জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে-নেওয়া বেনেবউ পাখি বা দোপাটি ফুলের কথা। এলো শহরজীবনের গ্লানির কথা; এলো প্রিয়ার কথা যার বাটিকে-আঁকা মুখের সঙ্গে মিশে যায় বিষম রাত্রি; এলো নীরবতায় যাপিত প্রেমের কথা; এলো কবিতার অবস্থানের কথা ('কবিতা এখন, নিজেই নিজের পুরাণ'); এলো প্রসঙ্গক্রমে এই শহরের নাট্যজগতের কথা, যা অনেক দৈবদুর্বিপাক অতিক্রম করে প্রবাহিত; এলো চিরকালীন ভারতবর্ষের একটি নিহিত প্রান্তিক খন্ডদৃশ্য ('সহসা নিষাদরুদ্র নুয়ে পড়ে নমঃশূদ্রতায়'-এর মতো বাক্য লিখলেন তিনি); এলো পাঠকের অমসৃণ প্রশ্ন থেকে সুসময়ের আনন্দে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার কথা।" (কালীকৃষ্ণ গুহ, *কবিতা ও কথার মর্মভেদী আলো*, কালি কলম)
- "কবির কোনো বিশুদ্ধ অবস্থানে বা তথাকথিত বিশুদ্ধ কবিতার অবস্থানে তিনি আটকে রইলেন না, যে-অবস্থানের একমাত্র লক্ষ্য হয়তো কাব্যসৌন্দর্য। তিনি জানালেন, 'এখন শিকড়িত মানুষ যত তার চেয়েও শরণার্থী মানুষ সারা পৃথিবীতে অনেক বেশি।' এই সূত্রে আরো জানালেন, 'আজ বিহারে যে মিশনারি নানদের বর্বরভাবে হত্যা করা হচ্ছে, সে-ঘটনাতে মুখ ফিরিয়ে যদি কোনো কবি কলেজ স্ট্রিটের প্রেসে লিরিক কবিতাগুলো ছাপতে চলে যান, তাহলে আমার মনে হয় লেখালিখি বন্ধ করে দেওয়াই ভালো। প্রতিবেশকে জানতে চান না এমন কবির কাছে আমি আজ যাব না।' ২০০৩ সালে এই কথা বলার ১৭ বছর আগে তিনি বলেছিলেন, 'আমি কবিতাকে দেখি দূরান্বয়ের শিল্প হিসেবে।... এক স্থানের সঙ্গে আরেক কালের একটা মায়াবী দূরত্ব কবিতায় তৈরি হয়। আমি এভাবে কবিতাকে দেখি যে, কবিতা কোনো অতীন্দ্রিয় কিছু নয় – কবিতায় সমস্তরকম সামাজিক, রাজনৈতিক, নৈতিক, দার্শনিক বর্গগুলিকে নিয়ে কবির ছিনিমিনি খেলার অধিকার আছে।'" (কালীকৃষ্ণ গুহ, *কবিতা ও কথার মর্মভেদী আলো*, কালি কলম)
- **আন্তিগোনের মিথ:** গ্রিক নাট্যকার সফোক্লিসের লেখা বিখ্যাত ট্র্যাজিডি *আন্তিগোনে*। এই ট্র্যাজেডির কাহিনি সংক্ষেপে এই: রাজা অয়েদিপাউসের ও রানী জোকাস্তার দুই পুত্র এটোক্লিস আর পলিনিসেস নিজেদের মধ্যে এই সমঝোতায় এসেছিল যে এক বছর এটোক্লিস ও অন্য বছর পলিনিসেস রাজা হয়ে রাজ্যশাসন করবে। এক বছর রাজ্যশাসন করবার পর যখন এটোক্লিসের সময় এল পলিনিসেসের হাতে রাজ্য শাসনভার তুলে দেওয়ার তখন এটোক্লিস শর্ত ভাঙল। সে রাজত্ব ত্যাগে সম্মত হল না। দুই ভাই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল এবং দুজনই যুদ্ধে মারা গেল। এটোক্লিস ও পলিনিসেসের মৃত্যুর পর ক্রেয়ন রাজা হলেন এবং তিনি ঘোষণা করলেন, পলিনেসেসের মৃতদেহকে কবর দেওয়া বা তার মৃত্যুতে শোকপালন করা নিষেধ। ক্রেয়নের রাজাজ্ঞাকে দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সঙ্গে উপেক্ষা করলে আন্তিগোনে, রাজসকাশে আনীত হলেন। ক্রেয়ন তাঁকে জীবন্ত অবস্থায় কবর দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। পরে ক্রেয়নের হৃদয়পরিবর্তন হয় এবং তিনি আন্তিগোনে মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু রাজার এহেন সিদ্ধান্ত জানার পূর্বেই আন্তিগোনে আত্মহনন করেন। এর পরবর্তীতে আন্তিগোনের শোকে আত্মহত্যা করে ক্রেয়নের পুত্র হ্যামিওন। হ্যামিওন আন্তিগোনেকে ভালোবাসত। হ্যামিওনের শোকে আত্মহত্যা করেন হ্যামিওনের মা, ক্রেয়নের পত্নী রানী ইউরিডাইস।
- এই কবিতায় এসেছে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কেয়া চক্রবর্তী অভিনীত আন্তিগোনে নাটকের প্রসঙ্গ।

**আন্তিগোনে মঞ্চ: কলকাতা**

**অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত**

বিদ্যুতের হঠাৎ অভাবে
অজিতেশ (ক্রেয়ন) কেয়া (আন্তিগোনে) সংলাপ থামিয়ে দিয়ে
নগরপ্রান্তরে এক অন্ধকার মাপে
'কেন এত অন্ধকার' 'আরো কতক্ষণ এই অন্ধকার'
একাকার দর্শকসত্তার
জিজ্ঞাসার মাঝখানে কারা যেন মঞ্চে উঠে গিয়ে
জ্বেলে দিল কয়েকটি মোম, তার সংক্ষিপ্ত আগুনে
ক্রেয়নের উত্তরীয় জ্বলে যায়, অগ্নিকান্ডে ঘৃতের আহুতি
আন্তিগোনে।

## *অবনী বাড়ি আছো:* শক্তি চট্টোপাধ্যায়

- শক্তি চট্টোপাধ্যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বহড়ু গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ১৯৩৩ সালের ২৭ নভেম্বর। তাঁর পিতার নাম বামানাথ চট্টোপাধ্যায় এবং মায়ের নাম কমলা দেবী। মাত্র চার বছর বয়সে তিনি তাঁর পিতাকে হারান এবং দাদুর বাড়িতে বড় হন। তিনি ১৯৪৮ সালে কলকাতার বাগবাজারে আসেন এবং সেখানে একটি স্থানীয় স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হন। স্কুলের এক জন শিক্ষকের কাছ থেকে তিনি প্রথম মার্কসবাদ সম্পর্কে জানতে পারেন। ১৯৪৯ সালে তিনি প্রগতি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রগতি নামে একটি হাতে লেখা পত্রিকা বের করা শুরু করেন। পরে হাতে লেখা ওই ম্যাগাজিন বহ্নিশিখা নামে মুদ্রিত আকারে বের হয়।
- ১৯৫১ সালে শক্তি চট্টোপাধ্যায় ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন এবং সিটি কলেজে বাণিজ্য বিভাগে ভর্তি হন। একই সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়ার সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করেন। পাস করার পর তিনি বাংলা সাহিত্যে অনার্স করার উদ্দেশে ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে। কিন্তু দারিদ্রের কারণে তাঁকে স্নাতক পাঠ অর্ধসমাপ্ত রেখে প্রেসিডেন্সি কলেজ ছাড়তে হয়। ১৯৫৬ সালে তাঁকে উল্টোডাঙার একটি বস্তিতে মা ও ভাইকে নিয়ে আশ্রয় নিতে হয়। সে সময়টায় তাঁর পরিবার পুরোপুরি ভাবে ভাইয়ের সামান্য আয়ের ওপর নির্ভরশীল ছিল।
- ১৯৫৬ সালের মার্চে বুদ্ধদেব বসুর কবিতা পত্রিকায় তাঁর যম কবিতাটি ছাপা হয়। পরে তিনি কৃত্তিবাস ও অন্যান্য পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করেন। এরই মধ্যে বুদ্ধদেব বসু তাঁকে নবপ্রতিষ্ঠিত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য কোর্সে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানান। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের কোর্সে ভর্তি হন। কিন্তু এখানেও তিনি পড়াশোনা শেষ করতে পারেননি। ১৯৫৮ সালে শক্তি চট্টোপাধ্যায় কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সম্পর্কের ইতি টানেন।
- জীবিকার জন্য তাঁকে সাক্সবি ফার্মা লিমিটেডে স্টোর সহকারীর চাকরি করতে হয়েছে। কিছু কাল তিনি ভবানীপুর টিউটোরিয়াল হোমের হ্যারিসন রোড শাখায় শিক্ষকতাও করেছেন। কিছু দিন ব্যবসা করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাতে সফল হতে না পেরে একটি মোটর কোম্পানিতে জুনিয়র এক্সিকিউটিভ হিসেবে যোগ দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনও কাজেই তিনি ঠিক মন বসাতে পারেননি।
- বাংলা সাহিত্যে স্থিতাবস্থা ভাঙার আওয়াজ তুলে, ইশতেহার প্রকাশের মাধ্যমে, শিল্প ও সাহিত্যের যে একমাত্র আন্দোলন হয়েছে, তার নাম হাংরি আন্দোলন। আর্তি বা কাতরতা শব্দগুলো মতাদর্শটিকে সঠিক তুলে ধরতে পারবে না বলে, আন্দোলনকারীরা শেষাবধি হাংরি শব্দটি গ্রহণ করেন। ১৯৬১ সালের নভেম্বরে পাটনা শহর থেকে একটি ইশতেহার প্রকাশের মাধ্যমে হাংরি আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন সমীর রায়চৌধুরী, মলয় রায়চৌধুরী, শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং হারাধন ধাড়া ওরফে দেবী রায়। শেষোক্ত তিন জনের সঙ্গে সাহিত্যিক মতান্তরের জন্য ১৯৬৩ সালে শক্তি চট্টোপাধ্যায় হাংরি আন্দোলন ত্যাগ করে কৃত্তিবাস গোষ্ঠীতে যোগ দেন। পরবর্তী কালে কৃত্তিবাসের কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নাম সাহিত্যিক মহলে একত্রে উচ্চারিত হত, যদিও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় হাংরি আন্দোলনের ঘোর বিরোধী ছিলেন।

- শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের লেখা প্রথম উপন্যাসের নাম ছিল কুয়োতলা। কিন্তু কলেজ জীবনের বন্ধু সমীর রায়চৌধুরীর সঙ্গে আড়াই বছর থাকার সময়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায় এক জন সফল গীতিকবিতে পরিণত হন। নিজের কবিতাকে তিনি বলতেন পদ্য। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলোর মধ্যে ধর্মেও আছো জিরাফেও আছো (১৯৬৭), সোনার মাছি খুন করেছি (১৯৬৮); অন্ধকার নক্ষত্রবীথি তুমি অন্ধকার (১৯৬৮); হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান (১৯৬৯); চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৯৭০); পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি (১৯৭১); প্রভু নষ্ট হয়ে যাই (১৯৭২); সুখে আছি (১৯৭৪); ঈশ্বর থাকেন জলে (১৯৭৫); অস্ত্রের গৌরবহীন একা (১৯৭৫); জ্বলন্ত রুমাল (১৯৭৫); ছিন্নবিচ্ছিন্ন (১৯৭৫); সুন্দর এখানে একা নয় (১৯৭৬); কবিতায় তুলো ওড়ে (১৯৭৬), ভাত নেই পাথর রয়েছে (১৯৭৯); আঙ্গুরী তোর হিরণ্য জল (১৯৮০); প্রচ্ছন্ন স্বদেশ (১৯৮১); যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো (১৯৮৩); কক্সবাজারে সন্ধ্যা (১৯৮৫); সন্ধ্যার সে শান্ত উপহার (১৯৮৬); এই তো মর্মর মুর্তি (১৯৮৭); বিষের মধ্যে সমস্ত শোক (১৯৮৮); আমাকে জাগাও (১৯৮৯); ছবি আঁকে ছিঁড়ে ফ্যালে (১৯৯১); জঙ্গলে বিষাদ আছে (১৯৯৪); বড়োর ছড়া (১৯৯৪); সেরা ছড়া (১৯৯৪); টরে টক্কা (১৯৯৬); কিছু মায়া রয়ে গেল (১৯৯৭); সকলে প্রত্যেকে একা (১৯৯৯); পদ্যসমগ্র ১ম খণ্ড থেকে ৭ম খণ্ড ইত্যাদি।
- কবিপ্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় আনন্দ পুরস্কার ও সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারসহ একাধিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ১৯৯৫ সালের ২৩ মার্চ তাঁর মৃত্যু হয়।
- *ধর্মে আছো জিরাফেও আছো* (১৯৬৫) কাব্যগ্রন্থের কবিতা।
- **তুলনামূলক আলোচনা :** The Listeners কবিতাটির সঙ্গে অনেকে এই কবিতাটির তুলনা করেন।
- **পরাবাস্তববাদ** (ইংরেজি: Surrealism): এ-মতবাদের মূলকথা অবচেতনমনের ক্রিয়াকলাপকে উদ্ভট ও আশ্চর্য সব রূপকল্প দ্বারা প্রকাশ করা। ডাডাবাদীরা যেখানে চেয়েছিলেন প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধকে নস্যাৎ করে মানুষকে এমন একটি নান্দনিক দৃষ্টির অধিকারী করতে যার মাধ্যমে সে ভেদ করতে পারবে ভণ্ডামি ও রীতিনীতির বেড়াজাল, পৌঁছাতে পারবে বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্যে; সেখানে পরাবাস্তববাদ আরো একধাপ এগিয়ে বলল, প্রকৃত সত্য কেবলমাত্র অবচেতনেই বিরাজ করে। পরাবাস্তববাদী শিল্পীর লক্ষ্য হল তার কৌশলের মাধ্যমে সেই সত্যকে গভীর থেকে তুলে আনা।
- সুররিয়ালিজম বা পরাবাস্তববাদের উদ্ভব ফ্রান্সে, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে। কবি গিওম আপলিনেয়ার প্রথম 'Super-realism' শব্দটি ব্যবহার করেন যুক্তির সীমানা ছাড়ানো এক বাস্তবের জগৎকে বোঝার জন্য। মনোবিদ-কবি আন্দ্রে বেঁতো এই কাব্যান্দোলনের অবিসংবাদী নেতা। তাঁর Surrealist Manifesto-তে তিনি ব্যাখ্যা করলেন সুররিয়্যালিজমকে:
  "...pure automatism by which an attempt is made to express, either verbally, in writing or in any other manner, the true functioning of thought. The diction of thought in the absence of all control by the reason, excluding any aesthetic or moral preoccupation."
- "সুররিয়েলিজম হচ্ছে শুদ্ধ মানসিক স্বতঃস্ফূর্ততা যার সাহায্যে মৌখিক, লিখিত বা অন্য যে কোনো ভাবে চিন্তার প্রকৃত ক্রিয়াকে উন্মোচনের চেষ্টা করা হয়। চিন্তার এই বিবৃতি যুক্তির সর্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত, সর্বপ্রকার নৈতিক পূর্বধারণাকে বর্জন করে। সুররিয়েলিজম নির্ভর করে এখন পর্যন্ত উপেক্ষিত কিছু অনুষঙ্গ অবয়বের উচ্চতর বাস্তবতায় বিশ্বাসের উপর, স্বপ্নের সর্বময় শক্তিতে, চিন্তার নিরাসক্ত প্রবাহে।" (মঞ্জুভাষ মিত্র, *আধুনিক বাংলা কবিতায় ইওরোপীয় প্রভাব*)
- **সুররিয়ালজমের চতুঃস্তম্ভ:**
  রাঁবোর বিস্ফোরক কল্পনাশক্তি ও প্রথাগতের প্রতি উন্মত্ত বিদ্রোহ, বোদলেয়ারের নৈতিকতার উর্ধ্বে স্থাপিত অবাধ সৌন্দর্যসম্ভোগের স্বাধীনতা, কার্ল মার্কসের বৈপ্লবিক ধারণা ও সর্বোপরি ফ্রয়েডের মনঃবিশ্লেষণ— এঁদের প্রত্যেকের কাছে কিছু না কিছু ঋণ গ্রহণ করেই গড়ে উঠেছে সুররিয়ালিজমের মৌল সিদ্ধান্তগুলি।
- ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজি অনুবাদে প্রকাশিত ফ্রয়েডের *Interpretation of Dream*, যেখানে স্বপ্নকে ফ্রয়েড ব্যাখ্যা করলেন মানবিক আকাঙ্ক্ষার Repression-এর রূপক হিসেবে। ফ্রয়েড মানবিক সব আকাঙ্ক্ষার উৎস হিসেবে দেখেছেন যৌন অবদমনকেই— Repression of libido। বহুদূর পর্যন্ত মার্কসবাদীরা ফ্রয়েডীয় তত্ত্বকে তাঁদের তত্ত্বের মধ্যে অঙ্গীকৃত করতে চেয়েছিলেন, পরে সে পথ আলাদা হয়ে যায়। মার্কসবাদীরা যে বৈপ্লবিক চিন্তার কথা বলছিলেন, বিদ্যমান সামাজিক বাস্তবকে পালটে দেবার জন্য সুররিয়্যালিস্টরা সেই বৈপ্লবিক চিন্তাকে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন মানব মনোজগতে। মানুষের এহেন অবচেতনের জগৎ সামাজিক নৈতিকতার দৃষ্টিতে কলুষিত, অসুন্দর। এই অবচেতনের অবদমনই সমাজিক নীতি। সমাজনির্ধারিত এই নৈতিকতাকে ভেঙে দেবার উদ্দেশ্য নিয়েও অবচেতনের ভাষিক প্রকাশ ঘটাতে চাইলেন সুররিয়্যালিস্টরা।

- মানুষের স্বপ্নজগৎ যা কিনা আসলে অবচেতনের জগৎ তা আপাতদৃষ্টিতে অসংলগ্ন, কার্যকারণপরম্পরাহীন। যদিও এই কার্যকারণপরম্পরাহীন, অসংলগ্ন মনোজগৎ আসলে সত্যতর এই বাস্তবের সাংকেতিক প্রকাশমাত্র। ফলত সুররিয়্যালিস্টরা তাঁদের কবিতায় আনলেন এমন সব রূপকল্প যা প্রথাগত নয়। ঠিক এই জায়গায় ফর্মের দিক থেকে রূপের দিক থেকে ইমেজিস্টদের কাছেও তাঁরা ঋণী।
- বিশ শতকের যে নব্য ইমেজিস্ট কাব্যান্দোলন গড়ে উঠেছিল তার মূল কথা ছিল আবেগের স্বতস্ফূর্ত চিত্ররূপায়ণ।
- বিশ শতকের প্রথম দশকে ইওরোপে 'Imagisme' নামে একটি সাহিত্য আন্দোলন উদ্ভূত হয়ে ওঠে।
- Ezra Pound, Hilda Doolittle, John Gould Fletcher, Amy Lowell, Richard Aldington, F. S. Flint প্রভৃতি কবিরা ছিলেন এই আন্দোলনের প্রাণপুরুষ। ১৯১২ সালে Poetry Review নামক একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এজরা পাউন্ডের বিখ্যাত প্রবন্ধ 'A Few Don'ts By an Imagiste'। এই প্রবন্ধের শুরুতেই 'চিত্রকল্প কী?' এই প্রসঙ্গে পাউন্ড জানিয়েছেন: "An "image" is that which presents an intellectual and emotional complex in an instant of time. I use the term "complex" rather in the technical sense employed by the newer psychologists, such as Hart though we might not agree absolutely in our application.
- সুররিয়্যালিস্টরা জোর দিলেন দুর্জ্ঞেয় প্রেমচেতনার যৌন-অবদমনের দিকেই। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য একটি কবিতা বিষ্ণু দে-র *ঘোড়সওয়ার*।
- মঞ্জুভাষ মিত্র বলেছেন: "বিষ্ণু দে-র ঘোড়সওয়ার কবিতায় এই স্বপ্নবৎ লেখনীচালনা, চিন্তার মুক্ত ভাবানুষঙ্গ পদ্ধতি, চেতনার আচ্ছন্ন উন্মত্ত অবস্থা, চিত্রকল্পের স্বেচ্ছাচারিতা প্রগাঢ়ভাবে পরিলক্ষিত হয়। বস্তুত এই একটি মাত্র কবিতার জন্য বিষ্ণু দে সুররিয়্যালিস্টরূপে পরিগণিত হতে পারেন।"
- অবচেতনার মধ্যেই অতিবাস্তবতার জন্ম। রোমান্টিক কাব্যআন্দোলন কখনও কখনও সে অর্থে সুররিয়্যালিস্টদের পূর্বসূরি। রোমান্টিক কবি Coleridge-এর Kubla Khan কবিতা আসলে এক স্বপ্নকথন। তবে রোমান্টিকদের উদ্দাম কল্পনার সঙ্গে সুররিয়্যালিস্টদের অবচেতন মনের প্রকাশের তুলনা টানলে তা অতিব্যাপ্তি দোষ হবে।
- জীবনানন্দকে অনেকে সুরিয়্যালিস্ট বলে চিহ্নিত করেছেন। তবে জীবনানন্দ সচেতনভাবে সুররিয়্যালিস্ট ছিলেন না। বস্তুত বিশ শতকের পাশ্চাত্য কাব্যান্দোলনের সঙ্গে রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিদের দেশগত-কালগত-ব্যক্তিগত নানা সংকট ও কাব্যাদর্শের বহুকৌণিক টানাপোড়েনেই গড়ে উঠেছে তথাকথিত রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিদের কাব্যবিশ্ব ও কাব্যের শিল্পরূপ।

**অবনী বাড়ি আছো**
**শক্তি চট্টোপাধ্যায়**

অবনী বাড়ি আছো
অবনী বাড়ি আছো
দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া
কেবল শুনি রাতের কড়ানাড়া
'অবনী বাড়ি আছো?'

বৃষ্টি পড়ে এখানে বারোমাস
এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে
পরাঙ্মুখ সবুজ নালিঘাস
দুয়ার চেপে ধরে–
'অবনী বাড়ি আছো?'

আধেকলীন হৃদয়ে দূরগামী
ব্যথার মাঝে ঘুমিয় পড়ি আমি
সহসা শুনি রাতের কড়ানাড়া
'অবনী বাড়ি আছো?'

**ঘোড়সওয়ার** (নির্বাচিত অংশ)
**বিষ্ণু দে**

হে প্রিয় আমার, প্রিয়তম মোর!
অযোজনে কাঁপে কামনার ঘোর
অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার?
হালকা হাওয়ায় বল্লম উঁচু ধরো।
সাত সমুদ্র চৌদ্দ নদীর পার—
হালকা হাওয়ায় হৃদয় দু-হাতে ভরো,
হঠকারিতায় ভেঙে দাও ভীরু দ্বার।
পাহাড় এখানে হালকা হওয়ায় বোনে
হিম শিলাপাত ঝঞ্ঝার আশা মনে।
আমার কামনা ছায়ামূর্তির বেশে
পায়-পায় চলে তোমার শরীর ঘেঁষে।
কাঁপে তনুবায়ু কামনায় থরথরো।
কামনার টানে সংহত গ্লেসিআর।
হালকা হাওয়ায় হৃদয় আমার ধরো,
হে দূর দেশের বিশ্ববিজয়ী দীপ্ত
ঘোড়সওয়ার!
সূর্য তোমার ললাটে তিলক হানে।
বিশ্বাস কেন বহিতেও ভয় মানে!
তরঙ্গ তব বৈতরণীর পার।
পায়ে-পায়ে চলে তোমার শরীর ঘেঁষে
আমার কামনা প্রেতচ্ছায়ার বেশে।
চেয়ে দেখ ঐ পিতৃলোকের দ্বার!
জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার—
মেরুচূড়া জনহীন—
হালকা হওয়ায় কেটে গেছে কবে
লোক নিন্দার দিন!
হে প্রিয় আমার, প্রিয়তম মোর,
আয়োজন কাঁপে কামনার ঘোর।
কোথায় পুরুষকার?
অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার?

**একটি কবিতা**

**জীবনানন্দ দাশ**

পৃথিবী প্রবীণ আরো হ'য়ে যায় মিরুজিন নদীটির তীরে;
বিবর্ণ প্রাসাদ তার ছায়া ফেলে জলে।
ও-প্রাসাদে কারা থাকে? কেউ নেই- সোনালি আগুন চুপে
জলের শরীরে
নড়িতেছে- জ্বলিতেছে- মায়াবীর মতো জাদুবলে।
সে-আগুন জ্ব'লে যায়- দহেনাকো কিছু।
সে-আগুন জ্ব'লে যায়
সে-আগুন জ্ব'লে যায়
সে-আগুন জ্ব'লে যায় দহেনাকো কিছু।
নিমীল আগুনে অই আমার হৃদয়
মৃত এক সারসের মতো।
পৃথিবীর রাজহাঁস নয়-
নিবিড় নক্ষত্র থেকে যেন সমাগত
সন্ধ্যার নদীর জলে এক ভিড় হাঁস অই- একা;
এখানে পেল না কিছু; করুণ পাখায়
তাই তারা ব'লে যায় শাদা, নিঃসহায়।
মূল সারসের সাথে হ'লো মুখ দেখা।

২

রাত্রির সংকেতে নদী যতদূর ভেসে যায়- আপনার অভিজ্ঞান
নিয়ে আমারো নৌকার বাতি জ্বলে;
মনে হয় এইখানে লোকশ্রুত আমলকী পেয়ে গেছি
আমার নিবিষ্ট করতলে;
সব কেরোসিন- অগ্নি ম'রে গেছে; জলের ভিতরে আভা দ'হে যায়
মায়াবীর মতো জাদুবলে।
পৃথিবীর সৈনিকেরা ঘুমায়েছে বিম্বিসার রাজার ইঙ্গিতে
ঢের দূর ভূমিকার পর;
সত্য সারাৎসার মূর্তি সোনার বৃষের 'পরে ছুটে সারাদিন
হ'য়ে গেছে এখন পাথর;
যে-সব যাবারা সিংহীগর্ভ জ'ন্মে পেয়েছিলো কৌটিল্যের সংযম
তারাও মরেছে- আপামর।

যেন সব নিশিডাকে চ'লে গেছে নগরীতে শূন্য ক'রে দিয়ে-
সব ক্বাথ বাথরুমে ফেলে;
গভীর নিসর্গ সাড়া দিয়ে শ্রুতি বিস্মৃতির নিস্তব্ধতা ভেঙে দিতো তবু
একটি মানুষ কাছে পেলে;
যে-মুকুর পারদের ব্যবহার জানে শুধু, যে দীপ প্যারাফিন,
বাটা মাছ ভাজে যেই তেলে,
সম্রাটের সৈনিকেরা যে-সব লাবণি লবণরাশি খাবে জেগে উঠে,
অমায়িক কুটুম্বিনী জানে;
তবুও মানুষ তার বিছানায় মাঝরাতে নৃমুণ্ডেরহেঁইয়ালিকে
আঘাত করিবে কোন্‌খানে?
হয়তো নিসর্গ এসে একদিন ব'লে দেবে কোনো এক সম্রাজ্ঞীকে
জলের ভিতর এই অগ্নির মানে।

**কাব্যগ্রন্থ:** ***সাতটি তারার তিমির***

**The Listener**

**Walter De La Mare**

'Is there anybody there?' said the Traveller,
Knocking on the moonlit door;
And his horse in the silence champed the grasses
Of the forest's ferny floor:
And a bird flew up out of the turret,
Above the Traveller's head:
And he smote upon the door again a second time;
'Is there anybody there?' he said.
But no one descended to the Traveller;
No head from the leaf-fringed sill
Leaned over and looked into his grey eyes,
Where he stood perplexed and still.
But only a host of phantom listeners
That dwelt in the lone house then
Stood listening in the quiet of the moonlight
To that voice from the world of men:
Stood thronging the faint moonbeams on the dark stair,
That goes down to the empty hall,
Hearkening in an air stirred and shaken
By the lonely Traveller's call.
And he felt in his heart their strangeness,
Their stillness answering his cry,

While his horse moved, cropping the dark turf,
'Neath the starred and leafy sky;
For he suddenly smote on the door, even
Louder, and lifted his head:—
'Tell them I came, and no one answered,
That I kept my word,' he said.
Never the least stir made the listeners,
Though every word he spoke
Fell echoing through the shadowiness of the still house
From the one man left awake:
Ay, they heard his foot upon the stirrup,
And the sound of iron on stone,
And how the silence surged softly backward,
When the plunging hoofs were gone.

Source: *The Collected Poems of Walter de la Mare* (1979)